শেষ মোগল সম্রাট পরিবারের করুণ কাহিনি

ইতিহাসের কান্না

রূপান্তর ও সম্পাদনা

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমে দীন

ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

সূচিপত্র

- কুলসুম যমানী বেগম–১৫
- গুলবানু–২৪
- শাহজাদী–২৯
- নারগিস নযর–৩৮
- মাহ জামাল–৪৭
- সাকীনা খানম–৫৭
- সবুজ পোশাকের বীরাঙ্গনা–৬৫
- বাহাদুর শাহ যাফর–৬৮
- মির্জা দিলদার শাহ–৭১
- মির্জা কমর সুলতান–৭৩
- শেষ সম্রাজ্ঞী
  পাকিজা সুলতান বেগম ও
  তাহেরা সুলতান বেগম–৭৫

কুলসুম যমানী বেগম

এক নিরুপায় দরবেশ-নারীর বিপন্ন অবস্থার সত্য কাহিনি এটি, যাঁর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল যুগবদলের প্রবল ঝাপটা। তাঁর নাম ছিল কুলসুম যমানী বেগম। ইনি ছিলেন দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফরের[১] আদুরে কন্যা।

কয়েক বছর হলো তিনি মারা গেছেন। কয়েকবার আমি নিজে শাহজাদী সাহেবার মুখে তাঁর অবস্থার কথা শুনেছি। কেননা, আমাদের হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে ইলাহীর প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ভক্তি। সেজন্য প্রায়ই তিনি দরগাহে আসতেন এবং আমি করুণ কাহিনি শোনার সুযোগ পেয়ে যেতাম। নিচে যতগুলো ঘটনা বলা হয়েছে তা হয় স্বয়ং তিনি নয়তো তাঁর কন্যা যীনাত যমানী বেগম আমাকে শুনিয়েছেন। যীনাত যমানী বেগম এখনো জীবিত এবং পণ্ডিতের গলিতে থাকেন। ঘটনাগুলো এ রকমের :

যে সময় আমার পূর্বপুরুষের বাদশাহী শেষ হলো এবং সিংহাসন মুকুট লুণ্ঠিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এল, সে সময় দিল্লির লাল কেল্লায় কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেছে। চারিদিকে কেউ কিছু খায়নি। যীনাত আমার কোলে, দেড় বছরের শিশু দুধের জন্য কাঁদছিল। ভাবনা-চিন্তায় না আমার বুকে দুধ ছিল, না কোনো ধাইয়ের। আমরা সবাই যখন এমনই বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলাম, জিল্লে সোবহানীর (মোগল যুগে বাদশাহকে এই উপাধিতেই সম্বোধন করা হতো। অর্থ : মহান আল্লাহর আশিসপূর্ণ ছায়া) বিশেষ খোজা আমাদের ডাকতে এল।

---

১. খাজা হাসান নিজামী তার মূল উর্দু বইয়ে লিখেছেন, 'আবু যাফর বাহাদুর শাহ।' নামটি 'বাহাদুর শাহ যাফর' রূপেই প্রসিদ্ধ বলে এ তর্জমায় আমরা এভাবেই লিখলাম। –অনুবাদক।

মধ্যরাত্রি, নিস্তব্ধতার পরিবেশ, গোলাগুলির নির্ঘোষে বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে কিন্তু বাদশাহর হুকুম পাওয়ামাত্রই আমরা হাজিরি দিতে পৌঁছে গেলাম। হুজুর তখন বসে। হাতে তসবীহ। যখন আমি সামনে গিয়ে মাথা নত করে তিনবার সালাম আরয করলাম, হুজুর আমাকে বড় স্নেহে কাছে ডাকলেন ও বললেন, 'কুলসুম, তোমাকে আমি খোদার হাতে সঁপে দিচ্ছি। ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে। তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে এক্ষুণি কোথাও বেরিয়ে পড়ো। আমিও যাব। মন তো চায় না যে, এই শেষ সময় তোমাদের চোখের আড়াল করি কিন্তু সঙ্গে রাখলে তোমার ক্ষতি হওয়ার ভয় রয়েছে। আলাদা থাকলে হয়তো খোদা তোমাদের কোনো ভালো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।'

এই বলে হুজুর তাঁর হস্ত মোবারক যা কাঁপুনিরোগে কাঁপছিল ওপরে ওঠান ও অনেকক্ষণ ধরে উঁচু গলায় আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকেন :

'খোদা তাআলা এই বেওয়ারিস বাচ্চাদের তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি। রাজমহলে যারা বাস করত, তারা আজ জনহীন জঙ্গলে যাচ্ছে। দুনিয়াতে এদের সাহায্য করার কেউ নেই। তৈমুর নামের মর্যাদা রক্ষা করো এবং এই নিরাশ্রয় নারীদের ইজ্জত বাঁচিয়ো। হে পরোয়ারদেগার, শুধু এই নয়, বরঞ্চ সমস্ত হিন্দুস্তানের তাবৎ হিন্দু-মুসলমান আমার সন্তান এবং সবারই আজ বিপদ। আমি অপয়া, আমার কর্মদোষে এদের মানহানি কোরো না বরং সবাইকে কষ্ট-হয়রানি থেকে মুক্তি দাও।'

তারপর তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। যীনাতকে আদর করলেন ও আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীনকে কিছু গয়নাগাঁটি দিয়ে নূরমহল সাহেবাকে আমাদের পথের সঙ্গিনী করে দিলেন। নূরমহল ছিলেন হুজুরের বেগম।

শেষরাতে কেল্লা থেকে বের হয় আমাদের কাফেলা। দুজন পুরুষ ও তিন জন মহিলা। পুরুষদের মধ্যে একজন আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীন এবং অন্যজন মির্জা উমর সুলতান—যিনি ছিলেন বাদশার ভগ্নীপতি। মেয়েদের মধ্যে এক আমি, দ্বিতীয় নবাব নূরমহল এবং তৃতীয় জন বাদশাহর বেয়াইন হাফিজ সুলতান। যে সময় আমরা ঘোড়াগাড়িতে বসি, সেটা রাত্রির শেষ প্রহর। সমস্ত তারাই অদৃশ্য, শুধু শুকতারা ঝিলমিল করছিল। আমরা যখন

আমাদের সাজানো সংসার ও সুলতানী মহলের দিকে শেষবার তাকালাম, বুক টনটনিয়ে উঠল। আমাদের চোখ ফেটে পানি এল। নবাব মহলের চোখও অশ্রুসজল। শুকতারার ঝিলিক ধরা দিয়েছে নূরমহলের চোখে।

শেষ পর্যন্ত লালকেল্লা থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে কোরালি গ্রামে পৌঁছলাম এবং সেখানে আমাদের গাড়িচালকের বাড়িতে নামলাম। খেতে পেলাম বাজরার রুটি ও ঘোল। সে সময় খিদের চোটে তাও বিরিয়ানি পোলাওর চেয়ে বেশি স্বাদ লাগল। একদিন কেটে গেল শান্তিতে। কিন্তু পরের দিন জাঠ ও গুজররা জড়ো হয়ে কোরালি লুঠ করতে চড়াও হলো। তাদের সঙ্গে শত শত মেয়েলোকও ছিল। তারা ডাইনিদের মতো আমাদের ছেঁকে ধরল। সমস্ত গয়নাগাঁটি ও কাপড়-চোপড় ওরা খুলে নিল। যে সময় এই দুর্গন্ধময় পঁচা মেয়েলোকগুলো তাদের নোংরা হাত দিয়ে আমাদের গলা খুবলে খুবলে দিচ্ছিল, তখন তাদের ঘাগরা থেকে এমন বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুচ্ছিল যে আমাদের দম আটকে আটকে যাচ্ছিল। এই লুঠের পরে আমাদের কাছে এতটুকুও কিছু অবশিষ্ট রইল না যাতে একবেলার খাবার জোটে। আমরা তখন বিহ্বল, না জানি এবার কী হয়! তেষ্টায় যীনাত কাঁদছিল। সামনে দিয়ে একজন কৃষক যাচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে তাকে ডাক দিলাম, 'ভাই, এই বাচ্চাটাকে একটু পানি এনে দাও।' কৃষকটি তক্ষুণি গিয়ে মাটির পাত্রে পানি নিয়ে এল। বলল, 'আজ থেকে তুই আমার বোন ও আমি তোর ভাই।' এই কৃষক কোরালি গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। তার নাম ছিল বস্তি। সে তার গরুর গাড়ি জুতে আমাদের সবাইকে বসিয়ে বলে, 'যেখানে বলবে সেখানে পৌঁছে দেব।' আমরা বলি, 'মীরাট জেলায় অজারাতে মীর ফয়েজ আলী শাহী হাকিম থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের বেশ ভালো সম্পর্ক। সেখানে নিয়ে চলো।' বস্তি আমাদের অজারাতে নিয়ে গেল। কিন্তু মীর ফয়েজ আলী চূড়ান্ত খারাপ ব্যবহার করলেন। সোজা কানের ওপর হাত রেখে বললেন, তোমাদের এখানে থাকতে দিয়ে আমার ঘর-গেরস্তালি নষ্ট হতে দিতে পারি না।

(মীর ফয়েজ আলীর ছেলে যখন এই বই পড়েন, তখন বলেন যে বেগম সাহেবার বক্তব্য ঠিক নয়। মীর ফয়েজ আলী তাদের সবাইকে নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন।)